The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 385-403, ISSN 2306-3920

ভাওয়াইয়া গানে প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণ

নাসরিন ইসলাম*

[**সার-সংক্ষেপ:** সাহিত্যের শিল্প রূপের একটি শাখা হল সংগীত। যখন ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের অনির্বচনীয় রূপ প্রকাশ সম্ভবপর হয় না, তখনই চিত্র এবং সংগীতের প্রয়োজন হয়। অলংকার, ছন্দ, বাক্যবিন্যাস প্রভৃতির আশ্রয়ে চিত্রকল্পের মাধ্যমে তা অসামান্য রূপ ধারণ করে। সাহিত্যের বর্ণনাতীত রূপ প্রকাশে এগুলোর সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়া আবশ্যক।]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।...উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০০: ৬৪৬)

গানের বাণীতে প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণ ভাওয়াইয়ার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। ভাওয়াইয়া গানে প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় বিচিত্রতা। গানে প্রেমিক অথবা প্রেমিকাকে প্রতীকী অর্থে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে কখনও প্রকৃতির পশু-পাখি, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, নদী-নালার সাথে তুলনা করা হয়েছে আবার কখনও দেখা যায় গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহার্য উপাদানও প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের এই বৈশিষ্ট্যই যথাযথভাবে মাটি ও মানুষের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি সম্পৃক্তার প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া গানের ভাষার প্রভাব অনস্বীকার্য। পাশাপাশি ভাওয়াইয়া সঙ্গীতাঞ্চলের জনমানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সমাজ-সাংস্কৃতিক, জীবন-জীবিকা, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, আশা-আকাংখা, প্রেম-বিরহ, প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, নৈসর্গিক এইসব কিছুর পটভূমিকা এবং প্রভাবও সমান গুরুত্ব বহন করে। এই প্রবন্ধের মুখ্য অভিপ্রায় ভাওয়াইয়া গানের কিছু উদাহরণ উল্লেখপূর্বক ভাওয়াইয়া গানে প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণের স্বরূপ অন্বেষণ।

ভূমিকা

ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি স্থল হিমালয়ের পাদদেশীয় তরাই অঞ্চল। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ উভয়ের ভৌগোলিক নির্দেশনা অনুসারে ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত। বাংলাদেশের দিনাজপুর ও রংপুর, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার এবং আসামের গোয়ালপাড়া ভাওয়াইয়া গানের প্রকৃত অঞ্চল।

* **ড. নাসরিন ইসলাম :** পিএইচ.ডি গবেষক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতাঞ্চল এমন একটি ভূখণ্ড যেখানে বাস করে বিভিন্ন জাতি বা নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ যেমন- দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয় ছাড়াও রয়েছে নানা ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠী। আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা ছাড়াও নানা ভাষা, উপভাষা, বিভাষার সন্ধান এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংহতি ও সম্মিলনবাদী চেতনায় এই ভূখণ্ডের মানুষ উদ্দীপ্ত।

> জাতিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি এবং রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসী রাজবংশী নামে পরিচিত। রাজবংশী সমাজ মূলতঃ কোচ জাতির অন্তভূক্ত। এরা মূল ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির অন্যতম শাখা 'বোড়ো' জাতি হইতে উদ্ভূত। (আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬৫: ২৫৭)

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর মাধ্যমে ভাওয়াইয়া গানের প্রাথমিক বিস্তার ঘটে। তবে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উত্তরবঙ্গের সকল সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাওয়াইয়া ক্রমাগত জনপ্রিয় সংগীত আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। ভাওয়াইয়া গান গোষ্ঠীগত আঞ্চলিক ভাষা উপভাষা বা লোকভাষায় রচিত হয়েছে।

> ভাওয়াইয়া গানের কথার মধ্যে যেসব ধ্বনির উপকরণ আছে, বিশেষত স্বরধ্বনির উপকরণ, সুর সেই উপকরণগুলোকেই অবলম্বন/বিলম্বন/প্রলম্বনের মধ্য দিয়ে শ্রুতিগ্রাহ্য করে তোলে। তার ফলে একটা আবেগময় ধ্বনিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এই ধ্বনিমণ্ডল সৃষ্টিই হচ্ছে ভাওয়াইয়ার বাজ্ময় অনুশীলন, যাকে এক অর্থে সাংগীতিক বিভাষা (Sub-dialect) বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুতরাং ভাওয়াইয়ার ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় হচ্ছে, এই গান কামরূপী উপভাষার সাংগীতিক বিভাষা। (নির্মল দাশ, ২০১৪: ১৬৭)

লোকসংগীত ভাওয়াইয়ার সুর, ভাব ইত্যাদির সঙ্গে ঐ অঞ্চলের প্রকৃতি, পরিবেশ, জন-জীবন, সংস্কৃতি ও প্রচলিত ভাষার সম্পর্ক স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের ভূমির গঠন ও প্রকৃতি, ভাষা ও ভাবের ঐক্য এবং জীবন প্রণালীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যই এই অঞ্চলে এই বিশেষ সংগীতের উৎপত্তি, লালন ও প্রসারতাকে সহায়তা করেছে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত সম্পর্কে আব্বাসউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছেন-

> এই গানের ভিতর সত্যিকারের কবিতা, এই গানের সুরে সত্যিকারের উদাস করা ভাব সারা বাংলার অন্তরবাণীর তারে এক অভূতপূর্ব স্পন্দন তুলেছে, কারণ এ শুধু কল্পনাবিলাস নয়, এ হচ্ছে মানব হৃদয়ের চিরন্তন সত্যের প্রতিচ্ছবি, তার সুখ-দুঃখ বিজড়িত জীবনের অকৃত্রিম চিত্র-মাখা। (আব্বাসউদ্দিন আহমদ, ২০১২: ১৪১)

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক সংগীত ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়া সংগীতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় লোকসমাজের জীবন দর্শন এবং সমাজ জীবনের আলেখ্য। এই ধারায় রয়েছে বিভিন্ন স্বাদ ও মেজাজের গান। যেমন, এককভাবে গীত, প্রেমগীতি, বাৎসল্য, বিরহ-মিলনের গান আবার যৌথভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গান, বিবাহ উৎসবের গান, শ্রমকার্য সম্পাদনের সময়ের গান ইত্যাদি। গ্রামীণ জনজীবনের প্রেম, বিরহ, মিলন, সুখ-দুঃখ এইসব মানবিক আবেদনের পাশাপাশি এই সঙ্গীতে উঠে এসেছে উত্তরাঞ্চলের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চালচিত্র। কথা ও সুরের এমন সার্থক মেলবন্ধন এবং সেই সাথে ভাব প্রকাশের জন্য উপমা-তুলনা-রূপক-প্রতীকের ব্যবহার ভাওয়াইয়া গানের সৌন্দর্যরূপকে করেছে অপরূপ।

> ভাওয়াইয়া সংগীতে এক গোপন নিভৃততম স্থান আছে। এই গানের অন্তঃগূঢ় ঝলক সংগীত রসিকরা আগে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু সময়ের নিরিখে কতভাবে জানা ব্যবহারিক গ্রামীণ জীবনের কতরকম চিত্র ও প্রকৃতি পরিবেশ রূপক ও উৎপ্রেক্ষার ভঙ্গিতে যুক্ত হয়েছে। উপমায় ধরা পড়েছে আটপৌড়ে, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের আর্তি। নদী,

> গাছ নিবিড়ভাবে গানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চলমানতা আর মানবদেহের প্রতীকী হয়ে। (জ্যোতির্ময় রায়, ২০১৪: ৩০৬)

ভাওয়াইয়া গানের বাণী, সুর এবং চিত্রকল্প, একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতিবিম্বিত রূপ। তিস্তা-তোরসা-মানসা-ধরলা নদী, উঁচু নিঁচু মেঠো পথ, সবুজ বিস্তীর্ণ মাঠ, বন জঙ্গল, ভূ-প্রকৃতি এখানকার সাধারণ জনমানুষকে ভাওয়াইয়া গান রচনায় প্রভাবিত করেছে। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা নিয়ে রচিত এই ভাওয়াইয়া গানে প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনজীবনের সার্থক কল্পচিত্র উপস্থাপিত হয়।

ভাওয়াইয়া গানে প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণ

ভাওয়াইয়া গানের বাণীতে প্রতীকতা, সাদৃশ্য, শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ, শব্দ-দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার, উপমান ও উপমেয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমুহের প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থক চিত্রকল্পের বুনন দেখা যায়। অরণ্য ও প্রকৃতির বুক ভেদ করে যে ভাষায়, উত্তরবঙ্গের মানুষের মর্মস্পর্শী বেদনা বা হাসি-কান্না প্রস্ফুটিত হয় তা হয়তো এই গানের বাণীতে নিম্নে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের ব্যবহারের জন্যই সম্ভব। ভাওয়াইয়া গানে প্রতীক নির্মিত হয়েছে নিম্নোক্ত উপাদান সমূহের বিশেষ ও সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে ।

১. প্রতীকতা (Symbolism)
২. সাদৃশ্য (Parallelism)
৩. শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ (Ornamentation)
৪. শব্দ-দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার (Double Ornamentation)
৫. উপমা (Metaphor)
৬. চিত্রকল্প (Imagery)

১. প্রতীকতা (Symbolism)

প্রতীকতা, অর্থাৎ অবয়ব, চিহ্ন, নিদর্শন, সংকেতের সাহায্যে ভাব প্রকাশের পদ্ধতি। প্রতীকতার আরোপ প্রথম শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ফরাসি সাহিত্যে।

> প্রতীকীবাদের প্রবক্তা ফরাশি লেখক হলেন রেবোঁ (Rimbend) এবং স্তিফেন মালার্ম (Stephane Mallarme)। এঁদের ভাবধারা পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যেও অনুপ্রবেশ করে। অবশ্য ফরাসি সাহিত্যেরও আগে প্রাচীন চৈনিক সাহিত্যেও প্রতীকতার মাধ্যমে বিবৃত নানা কাহিনীর কথা জানা যায়। এগুলি মূলতঃ সাঙ্কেতিকধর্মী এবং গুহ্য তত্ত্বকথাতেই ব্যবহৃত হত। (ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ১১৮)

উনিশ শতক থেকে সাহিত্য ও শিল্পের নান্দনিক মূল্যমান নির্ধারণে প্রতীকতা বা সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে পাশ্চাত্যে এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোককবিদের সৃষ্টি ভাওয়াইয়া গানে প্রতীকতার ব্যবহৃর হয়েছে, যাদের সাথে পরিশীলিত সাহিত্যের কোন যোগাযোগ নেই। ভাওয়াইয়া সংগীতে লোকসমাজের জীবনদর্শন এবং সমাজজীবনের আলেখ্য বর্ণনায় প্রতীকী শব্দ এবং শব্দসমুহের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায়। চন্দ্র, সূর্য, তারা, মেঘ, বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখী, গাছ-গাছালী ইত্যাদিকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে নানা ধরণের ভাওয়াইয়া গান রচিত হয়েছে। অতীতে বৃত্তিগতভাবে মাহুত ও মৈশালের সাথে হাতি ও মোষ উত্তরের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাই হাতি, মোষ অথবা গরু ইত্যাদি ভারবাহী পশুদের নিয়ে অনেক গান রচিত হয়েছে। এছাড়াও ভাওয়াইয়া গানে তার প্রতিবেশের বিভিন্ন

প্রাণী এমন কি বন্য প্রাণী যেমন শিয়ালকে সাঙ্কেতিক অর্থে প্রেমিকের পরিচয় বিবৃত করতে নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে :

> পাটাবাড়িত্ মোর শিয়াল কান্দে,
> কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে,
> আজি কালা মুই একেলায় রে।
> (ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ১১৯)

গানটি শুনলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে গ্রামের নিঝুম রাত, সমস্ত গ্রামের মানুষ ঘুমে অচেতন, শুধু জেগে আছে একটি প্রেমিকার মন। বাড়ির পাশে প্রেমিকের বিরহী মনের কান্না শুনে রাত কাটায়, এই নিঃসঙ্গ রাতে প্রিয়া তার প্রেমিকের সঙ্গ প্রত্যাশা করে। শেয়ালের কান্না গ্রামীণ জন-জীবনের একটি সাধারণ এবং অতি পরিচিত ঘটনা। তাই ভাওয়াইয়া গানে যখন শেয়ালের এই কান্নাকে প্রেমিকের মিলনের আকুতির কান্নার সাথে তুলনা করা হয় তখন যেন আমরা অতি সহজেই সেই কান্নার তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহী মনের ছবি। গ্রামীণ সমাজ প্রতিবেশের সাথে নিবিষ্ট যা জীবনের অপূর্ব এক চিত্র। এটি ভাওয়াইয়া গানে প্রতীকতা ব্যবহারের একটি সার্থক উদাহরণ।

> ভাগিনা ধান মাড়িয়া দে—।
> মরুচের গচগিলা থাগড়াথুগড়ি ফল বিস্তর ধরে
> হাত বাড়াইতে মরুচের গচ হালিয়া দুলিয়া পড়ে।
> (ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ১১৮)

এই গানটিতেও আমরা দেখতে পাই গ্রামের সাধারণ একটি ফলন্ত লঙ্কার গাছকে পূর্ণযৌবনা নারী শরীরের প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এখানে আদি রসাত্মক একটি অনুভূতিকে খুব সুন্দরভাবে দৃশ্যমান করা হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের বাণীতে প্রতীকতা বা সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার পরিশীলিত সাহিত্যের মতই মুন্সিয়ানার পরিচয় বহন করে।

মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষের নশ্বর দেহ প্রকৃতির নিয়মে বয়সের সাথে সাথে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ে। ভাওয়াইয়া গানেও মানবজীবনের এই বাস্তব সত্যের প্রকাশ দেখা যায়। যেমন :

> দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে
> রঙিলা দালানের মাটি।
> (জ্যোতির্ময় রায়, ২০১৪: ৩১১)

এখানে 'রঙিলা দালান'-কে মানুষের বিনাশী এবং ক্ষণস্থায়ী দেহের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। যা মানুষের বয়স বাড়ার সাথে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে।

২. সাদৃশ্য (Parallalism)

রচনায় সাদৃশ্যের ব্যবহার করে রসোত্তীর্ণ করা সাহিত্যের অন্যতম নান্দনিক বৈশিষ্ট্য। সাদৃশ্য অর্থাৎ তুলনা করা। ভাওয়াইয়া গানেও এর সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। প্রকৃতির গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদ-নদী প্রভৃতিই ভাওয়াইয়া গানের সাযুজ্যতার উপকরণ।

> লোকমানসে নিসর্গ-প্রীতি অসাধারণ। কিন্তু সেই নিসর্গ-প্রীতির প্রকাশ মার্জিত সাহিত্যের মতো সূক্ষ্ম কারুকাজ ভরা নয়, গভীর অন্তর্দৃষ্টিও তাহাতে নাই। নিসর্গকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে দেখিয়া উহার স্থুল দিকটাকেই এমন কারুমণ্ডিত করিয়া লোকসঙ্গীতে প্রকাশ করা হয় যে, দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতাকে এড়াইয়া সময় সময় তাহাও নির্মল কাব্যরসের আধার হইয়া উঠে। (ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৩: ৩৯৯)

ভাওয়াইয়া গানে প্রকৃতির গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদ-নদী প্রভৃতির সাথে মানুষের ভাবাবেগের তুলনা করা হয়। অর্থাৎ অদৃশ্যমান ভাবাবেগের গভীরতা বোঝাতে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক উপকরণের সাথে তুলনা করা হয়। এই ধরণের গানের বাণীতে 'ঐ মতন' কিংবা 'যেমন-তেমন' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

ও নদীরে, ও মোর তিস্তারে।
ওরে তোর য্যামোন থৈ থৈ ব্যালা
সেই মতন মোর হৃদয়ের জ্বালা রে।
(ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ১১৯)

এই গানে তিস্তা নদীর উথাল পাথাল ঢেউয়ের সাথে প্রেমিক বিহনে নারীর অস্থির হৃদয়ের উচাটন অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রামীণ জনজীবনে নদী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা, কালজানি, ধরলা ইত্যাদি বহু নদ-নদী এই ভাওয়াইয়া অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। হিমালয় পাহাড় থেকে নেমে সমতলে আসার পথে স্রোতের তীব্রতা অনেকখানি প্রশমিত। কিন্তু বর্ষায় ফুলেফেঁপে দু-কুল ভাসিয়ে দেয়। এই গানে তিস্তা নদী যেন একজন ব্যক্তি বা জীবন্ত সত্তা। প্রেমিকার হৃদয়ের জ্বালার তীব্রতা যেন তিস্তা নদীটিই সব চাইতে ভালোভাবে বুঝতে পারে। গানের শ্রোতারা যেন চোখ বন্ধ করে সহজেই তিস্তা নদীর পাড়ে চলে যায়। নদীর থৈ থৈ ঢেউয়ের সাদৃশ্য যেন প্রেমিকার অদৃশ্য এই অস্থির অনুভূতির একটি দৃশ্যমান চিত্র। ভাওয়াইয়া গানের বাণীতে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ধরণের আরো অনেক সাদৃশ্যের ব্যবহার লক্ষণীয়।

বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে
মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে।
(মুস্তাফা জামান আব্বাসী, ২০০৯: ৪৭)

বটবৃক্ষের ছায়ার সাথে প্রেমিকের মায়া ভরা মনের তুলনা বা সাদৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। গ্রামীণ জনজীবনে বট গাছ একটি অত্যন্ত অর্থবাহী বৃক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাওয়াইয়া গানের এই বাণী আমাদের খুব সহজেই নিয়ে যায় গ্রীষ্মের খরতাপে তপ্ত দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে একটি শান্ত বট গাছের কাছে। গ্রীষ্মের খরতাপের সময় যেমন শান্ত বটের ছায়া আমাদের মনকে প্রশান্তি দেয় ঠিক তেমনি প্রেমিকা তার বন্ধুর উপস্থিতিকে বট বৃক্ষের ছায়ার প্রশান্তির সাথে তুলনা করেছে। বন্ধুর উপস্থিতিতে মনের অনুভূতি দৃশ্যমান নয়। এই অদৃশ্য অনুভূতিকে দৃশ্যায়িত করতে গীতিকার এখানে নৈকট্যজাত উপস্থিতির অনুভূতিকে প্রশান্তির ও সুশীতল বটবৃক্ষের ছায়ার সাথে সাদৃশ্যকরণের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। প্রেমিককে বটবৃক্ষের ছায়ার সাথে তুলনা সাদৃশ্য (Parallalism)-এর এটি একটি চমৎকার উদাহরণ।

বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে
ঐ মতন মোর গাড়ির চাকা পন্থে পন্থে ঘোরে
ও কি গাড়িয়াল মুঁই চলং রাজপন্থে।
(জ্যোতির্ময় রায়, ২০১৪: ৩১১)

এখানে বাউকুমটা (চৈত্র মাসে ধূ-ধূ প্রান্তরে আউস ধানের ক্ষেতে ঘূর্ণায়মান বাতাস) বাতাসের চলনকে গরুর গাড়ীর ঘূর্ণায়মান চাকার সাথে তুলনা বা সাদৃশ্যকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। গাড়িয়াল ভাই যখন জীবিকার অন্বেষণে ধূ-ধূ প্রান্তরের রাজপথে গরুর গাড়ী নিয়ে দুলকী চালে চলতে থাকে, তখন তার মনে জাগে হতাশা, জাগে প্রশ্ন, এই পথ চলার শেষ কোথায়? হয়তো তাকে সারাজীবন এভাবেই ঘুরে ঘুরে মরতে হবে। বাউকুমটা বাতাসের মতনই যেন গাড়িয়াল ভাইয়ের গাড়ির

চাকা এবং সেই সাথে তার ভাগ্যের চাকাও ঘূর্ণায়মান। ভাওয়াইয়া গানে সাদৃশ্যকরণের এটি একটি সার্থক উদাহরণ।

গ্রামীণ জন-জীবনে মানুষের দুঃখ-বদনা, হাসি-কান্না, আনন্দ-শূন্যতা, কামনা-বাসনা, দেশপ্রেম ইত্যাদি মানবিক বোধের বহিঃপ্রকাশে এই গানের স্রষ্টারা বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে ভিন্ন মাত্রার ছবি অঙ্কন করেন।

কইলজা খান মোর ধুক ধুকাইছে যে
ও যেমন ঢেঁকিত ভুকায় ধান
তুই বন্ধুয়া না আসিলে না বাঁচিবে প্রাণ বন্ধুরে।
(সোহরাব দুলাল, ২০১৪: ১৬২)

গ্রামের পল্লীবালা তার বন্ধুর আসার অপেক্ষায় অস্থিরভাবে অপেক্ষমান। সেই কারণে তার বুকের ভেতর প্রচণ্ড গতিতে হৃদকম্পন শুরু হয়েছে। এই অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে নায়িকা ঢেকিতে ধান ভানার সময় যে শব্দের সৃষ্টি হয় তার সাথে তার অপেক্ষমান অস্থির হৃদয়ের তুলনা করেছেন।

পূবালী বাতাস যেমন কাশিয়ার ফুলও নাচে
ঐ মতন মন নাচিয়া ওঠে, যখন ঐ গান বাজে ভাওয়াইয়ারে।
(সোহরাব দুলাল, ২০১৪: ১৬৩)

এখানে ভাওয়াইয়া গানের সুরের সাথে যেমন করে নায়িকার মন নেচে উঠে এবং তার সাথে পূবের বাতাসে নেচে ওঠা কাশিয়ার ফুলের (কাঁশ ফুলের) তুলনা করা হয়েছে।

লাউয়ের আগা যেমন ভাইরে হলপল হলপল করে
ঐ মতোন নারীর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে।
(সোহরাব দুলাল, ২০১৪: ১৬৩)

এখানে নারীর যৈবনকে দ্রুত বেড়ে উঠা লাউয়ের ডগার সাথে তুলনা করা হয়েছে। লাউয়ের ডগা এখানে উপমা এবং নারীর যৈবন উপমান।

মনে বড় দুঃখ নাইয়ারে চিতে বড় দুঃখ
ওরে নদীর পাথারের মত ভাঙে নারীর বুকরে।
(সোহরাব দুলাল, ২০১৪: ১৬৩)

এখানে নদীর পাথার অর্থাৎ নদীর পাড় ভাঙার সাথে দুঃখভারাক্রান্ত নারী হৃদয়ের বুক ভাঙা কান্নার সাথে তুলনা করা হয়েছে। নারীর বুক ভাঙা কান্নার চিত্রকল্প তৈরিতে নদীর পাড় ভাঙার তুলনা নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী উদাহরণ।

জল ছাড়া মাছ যেমন বন্ধু ছাড়া মুই তেমন রে। (সোহরাব দুলাল, ২০১৪: ১৬৩)

পানি ছাড়া যেমন মাছের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না তেমনি বন্ধু ছাড়া নারীর জীবনও দুর্বিসহ। মানুষ ও প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাওয়াইয়া গানে।

৩. শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ (Ornamentation)

ভাওয়াইয়া গানে উত্তরাঞ্চলের বিশেষ ধরণের আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগের প্রচলন দেখা যায়, যা একান্তভাবে শুধুমাত্র ভাওয়াইয়া অঞ্চলের গ্রামীন জনজীবনের নিজস্ব সম্পদ।

> প্রত্যেক দেশের কাব্যের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, লিখিত সাহিত্য থেকে যা স্বতন্ত্র। রাজবংশী উপভাষাতেও সঙ্গীত সাহিত্যে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার হয় যা লিখিত গদ্যসাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র। (ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ১১৯-২০)

বিশেষণধর্মী এই শব্দগুলোর সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া অনেক সময় কঠিন। তবে এই আঞ্চলিক ভাষার বিশেষণগুলোর ব্যবহারের কারণেই হয়তো ভাওয়াইয়া গান তার মূলভাব প্রকাশে এতটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সরল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য :

১. একে কন্যা (*যম কালাটি*)। (কন্যা যমের মত কালো)
২. চলন কোনা (*সাটাম সুটুম*) গোপের উপুরা দাড়ি। (দাপটের সাথে চলা)
৩. তাতে হইলেক (*দারুন টসী*)। (কানে শোনে না)
৪. বাম গালে তার (*টোঙ্গুরা ফুলা*)। (গালের ভেতর ফল রাখলে যে ভাবে ফুলে উঠে)
৫. (*টস্যা নাগা*) হুকা চক্ষু মুজিয়া টানে। (পুরানো হুকা, যা পরিষ্কার না করলে ময়লায় বন্ধ হয়ে যায়)
৬. ডাইন চক্ষে তার (*ফলি পড়া*)। (চোখে ছানি পড়া)
৭. একে পাত্র (*যম পাগেলা*), তাতে হইল (*গালা ফুলা*)। (পাগল), (গলা ফুলা)
৮. (*প্যাট ঢ্যাপরা*)। (কমলা লেবু মত পেট)
৯. পিটিত একটা (*দারুন কুঁজ*) সেইঠে দেয় মোকে। (পিঠে কুঁজ)
১০. মোক বোলে বেচেয়া খায় (*তেমেলা ঘরে*)। (তিন তলা ঘরে)

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্যকে নারীর মনের বিচ্ছেদ বেদনার সাথে সাদৃশ্য করে রচিত হয়েছে নানা ভাওয়াইয়া গান। শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন-

ও কি গাড়ীয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চায়ারে
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুইরা রয় রে
ও কি গাড়ীয়াল ভাই
হাঁকাও গাড়ী তুই চিল মারির বন্দরে রে
আর কি কব দুস্কেরও জ্বালা গাড়িয়াল ভাই
গাঁথিয়া চিকনমালা রে।
ও কি গাড়িয়াল ভাই
কতই কাঁদি মুই নিধুয়া পাথারে রে।
(মুস্তাফা জামান আব্বাসী, ২০০৯: ২৯)

'নিধুয়া পাথার' অর্থাৎ বিস্তীর্ণ জনমানব শূন্য প্রান্তর। প্রেমিক বিহনে নারী মনের শূণ্যতা যেন এই জনমানব শূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর। গ্রামীণ নৈসর্গের সাথে নারী মনের বিরহ জ্বালার সহজ-সরল তুলনা। আরেকটি ভাওয়াইয়া গানে প্রেমিকের প্রতি অভিমানে নারী বিরহের বর্ণনা-

আর যদি দ্যাকোং আর যদি শোনোং
অইন্যজোনের সঙ্গে কতা
এ হেনা যৈবন সাগরে ভাসামো
পাষাণে ভাঙ্গিমো মাতা। (ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ২০০)

এখানে লোককবি নায়িকার সতীন সমস্যায় ব্যথিত মনের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সাগরে ভাসাবো' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নায়কের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে, তাকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার আকাঙ্খায় নায়িকা তার যৈবন সাগরে ভাসাতেও যেন প্রস্তুত।

এরকম আরও অনেক শব্দের ব্যবহার উত্তরের ভাওয়াইয়া গানে দেখা যায়। যেমন, অসের যৈবন, নিদয়া, কোলার মাইয়া, ইমিকি ঝিমিকি পানি, নিদারুন হয়া, অসের গালা, হাউসের দিন, কটুর হিয়া, পূবাল বাতাস, পচ্চিয়া বাও, মলেয়ার ঝড়, কাঞ্চের কলসী, ভাবের বন্দুয়া, চিকন কালা, অঞ্চলের গুয়া, ওভাগোনী, স্যাও, শাঙ্খা, পাঙ্খা, আঙ্কি, চিরৎকাল ইত্যাদি।

প্রমিত বাংলা ভাষায় হয়তো এসব শব্দের সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে আঞ্চলিক ও নিত্য ব্যবহৃত এই শব্দগুলোর ব্যবহারের কারণেই হয়তো ভাওয়াইয়া গানের চিত্রকল্প আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

> ভাওয়াইয়া সংগীতে বহু শব্দ ব্যবহৃত হয় যা অর্থগত দিক থেকে বিশেষ মাত্রার। এইসব গুণবাচক বা অবস্থাবাচক শব্দের ব্যবহারেই ভাওয়াইয়ার সৌন্দর্য রহস্য বিশেষ মাত্রা লাভ করে। ভাবলে অবাক লাগে গ্রামের অখ্যাত, অশিক্ষিত শিল্পী, গীদাল, দোয়ারীরা রীতিমতো প্রাকৃতি পরিবেশকে আত্মস্থ করে যথার্থ এক ভাবুক মননশীল শিল্পীর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যা আজও সংগীতজ্ঞদের আলোড়িত করে। মলেয়া বাও/মলেয়ারতলার বাও (মলয় বাতাস), পূবান বাতাস/পছিয়া বাও....শুন দুপুর/শুন দুফর, নিশিপহর, কানা ম্যাঘা, নদীর বসন্তকাল, চিকনবালা, ধই ধই বালা, ধিকি আগুন, নয়া বাটার পান, নিদারুণ কতা, নিধুয়া পাথার (বিস্তীর্ণ জনমানবশূন্য প্রান্তর), লালবাজারের চ্যাংড়া বন্ধু (প্রেমের জীবনকে রঙিন করে এমন প্রেমিক), কাজল ভোমরা, সোনার যৈবন, হীরামন বাঁশি (যে বাঁশির সুর মনকে বিচলিত করে), চিক্কিৎ হাসি, চিকন কালা ইত্যাদি। এরকম অজস্র কথা শব্দের মধ্যে এক আবেগ ধ্বনিমণ্ডল বিস্তৃত হয়। এই ধ্বনিমণ্ডল সৃষ্টিই হচ্ছে ভাওয়াইয়ার বাঙ্ময় অনুশীলন এবং বিশেষত্ব। (জ্যোতির্ময় রায়, ২০১৪: ৩০৯)

৪. শব্দ-দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার (Double Ornamentation)

শব্দ-দ্বৈত হচ্ছে যুগ্ম বা জোড়া শব্দ। যা মূলত শব্দালংকার হিসেবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। কোন একটি বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য দুই শব্দের অর্থাৎ শব্দ-দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

> ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে শব্দ-দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শব্দ-দ্বৈতের ব্যবহারে কাব্যে এক নতুন ব্যঞ্জনা আনে। (ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২০১১: ১২০)

এক্ষেত্রে প্রায়শই খুব কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় যা শেষ পর্যন্ত একই অর্থ বা ভাব বহন করে :

আবো নওদাড়িটা মরিয়া মোর সে হইছে হানী
আঁধার ঘরোৎ পড়ি থাকোং পড়ে চোখের পানি
    আবো টাপ্পাস কি টুপ্পুস করিয়া।
(আবো) সগাঁয় বেড়ায় টাড়ি টাড়ি নাল শাড়ি পিন্দিয়া
    তোলা আছে ঢাকাই শাড়ি কাঁয় যাইবে পিন্দিয়া
    ওকি খস্যোর কি মস্যোর করিয়া।
(আবো) আশ-পড়শী নাইওর যায় দোকল জুড়িয়া
    মোর নওদাড়ী থাকিল হয়-নাল শাড়িখান পিন্দিল হয়
    পাছোৎ গেইল হয় চালালাৎ কি চালালাৎ করিয়া।
(আবো) আসিল যে গরম কাল শুইয়া নিদ্রা যাঁও,
    মোর নওদাড়ী থাকিল হয় বগলেতে বসিল হয়
    গাও হাকাইল হয় ক্যাররোৎ কি কোররৎ করিয়া।
    আসিল যে বর্ষাকাল মাছ মারি আনিনু
    মোর নওদাড়ী থাকিল হয় বগলেতে বসিল হয়
    মাছ কুটিল হয় ঘ্যাচ্চোৎ কি ঘোচ্চোৎ করিয়া।
আবো) মোর নওদাড়ী মরিয়া মোর সে হইছে দুখ
    নদীর কাছাড়ের মতো ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক

আবো হিড়িড়িম কি হাড়াড়াম করিয়া
ওকি দিড়িড়িম কি দাড়াড়াম করিয়া।
(আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড, এইচএমভি, এন ২৭০৪৪। নভেম্বর ১৯৪০)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই চট্‌কা গানটি দেড়শত বছর আগে রংপুরের ডি সি স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন সংগ্রহ করে ছিলেন। বাংলা গানের এটি একটি প্রাচীনতম সংগ্রহ। নতুন বিবাহিত স্ত্রী মারা গেছেন, যুবক গাইছে তার দিদিমাকে উদ্দেশ্য করে। শব্দ এখানে ধ্বনির অনুগামী। গানটি রংপুর এবং কুচবিহারের কথ্য ভাষায় রচিত। এই গানটিতে লক্ষণীয় যে সব শব্দ-দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহার দেখা যায় তা হল :

'টাপ্পাস কি টুপ্পুস' (চোখের পানি পড়ার শব্দ নির্ভর দৃশ্যায়ন)।
'খস্যোর কি মস্যোর' (নতুন শাড়ি পরে চলার শব্দ)।
'চালালাৎ কি চালালাৎ' (হেলে দুলে চলা)।
'ক্যাররোৎ কি কোর্‌রৎ' (শরীর চুলকে দেয়ার শব্দ)।
'ঘ্যাচ্চোৎ কি ঘোচ্চোৎ' (মাছ কাটার শব্দ)।
'দিড়িড়িম কি দাড়াড়াম্' (নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়ার শব্দ)।

নদীর পানির মধ্যে হেটে যাওয়ার শব্দকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে-

'হাটিয়া যাইতে নদীর জল— খাল্‌লুম কি খুল্‌লুম কি খল্লাল্ খাল্লাল্ করে।

এখানে পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার শব্দকে শব্দ-দ্বৈতের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ শব্দগত অভিজ্ঞতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানে এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ধরণের শব্দ-দ্বৈতের ব্যবহার ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প তৈরিতে অনন্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। চিত্রকল্পগুলো জীবন ও জীবিকা, প্রেম ও প্রণয়, আনন্দ ও বিরহ সম্পর্কিত হওয়ায় তা হয়ে উঠেছে জীবন ঘনিষ্ঠ এবং ঐতিহ্য মণ্ডিত। পল্লীর সাধারণ মানুষদের জীবনকথা, জীবনচিত্র সম্পর্কিত চিত্রকল্পসমূহ ভাওয়াইয়া গানকে করেছে মহিমান্বিত।

৫. উপমা (Metaphor)

ভাওয়াইয়া গানে উপমার প্রয়োগ অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপমা হচেছ রুপকালঙ্কার বা রূপক। উপমার দুটি অংশ। উপমান অর্থাৎ যার সাথে উপমা দেয়া হয় এবং উপমেয় অর্থাৎ উপমার বিষয়ীভূত বা উপমিত হয়েছে এমন। ভাওয়াইয়া গানের উপমা সহজে চেনা যায়, কাছে থেকে ছোঁয়া যায়। নদী, হাওয়া, জল, আগুন, মাছ, পাখি, ছায়া এখানে মানুষের উপমান। আর উপমেয়গুলো চির চেনা। এই উপমাগুলো গ্রামীণ জন-জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা থেকেই সংগৃহীত। ভাওয়াইয়া গানে এমন সব বিষয়কে উপমা ও উপমেয় করা হয়েছে যা পরিশীলিত বা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়নি। এখানেই ভাওয়াইয়া গানের বিশিষ্টতা :

ও কি ও বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যান কয়া যান রে।
যদি বন্ধু যাবার চান
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যান রে।
(আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড, এইচএমভি, এন ১৭০০৬)

'কাজল ভ্রমরা' অর্থাৎ কালো ভ্রমরা হচ্ছে এখানে উপমা আর যার সাথে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ 'বন্ধু' হচ্ছে উপমান। গানটিতে নায়িকা তার প্রেমিককে কাজল ভ্রমরার সাথে তুলনা করছেন। কাজল

ভ্রমরা অর্থাৎ কালো ভ্রমর যেমন ফুলের মধু সংগ্রহে ফুলের কাছে আসে ঠিক তেমনিভাবে প্রেমিকা তার প্রেমিককে অনুনয় করে জানতে চাইছেন যে কোন দিন সে তার কাছে আসবেন। 'কাজল ভ্রমরা' এই একটি মাত্র উপমা দিয়ে নায়িকা তার সাথে তার বন্ধুর সম্পর্কের নৈকট্য অত্যন্ত সহজভাবে প্রকাশ করেছে।

গানের কথায় আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠে একটি মায়াময় শ্যামল গাঁয়ের ছবি যেখানে নায়িকার গাড়িয়াল, মইষাল অথবা মাহুত বন্ধু জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নায়িকাকে রেখে দুর দেশে চলে যায়। নায়িকার বিরহী প্রাণের হাহাকারে ভারি হয়ে উঠে আকাশ বাতাস। আমারা যেন দেখতে পাই গ্রামের একটি মেঠো পথ, যে পথ মিলিয়ে গেছে সুদূরে। যে পথের ধুলোয় মিশে আছে বন্ধুকে শেষ বারের মত দেখার স্মৃতি। পথের পাশেই ছোট ফুলের গাছ যেখানে ফুলের ওপর বসে আছে ভ্রমর, সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে নায়িকা যেন একান্ত চিত্তে ভাবছে বন্ধুর কথা। যেদিন তার বন্ধু এই পথ ধরে চলে গিয়েছিল সেদিন বড় অনুনয় বিনয়ে নায়িকা তার বিরহের জ্বালা ভুলে থাকার জন্য বন্ধু ঘাড়ের গামছা (যে গামছা দিয়ে পরিশ্রান্ত বন্ধু তার ঘাম মোছে) চেয়ে রেখেছিল। গ্রামীণ জীবনের অতি সাধারন একটি ব্যবহারের গামছা দিয়ে কত সহজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রণয়ভাবের অভিব্যক্তি।

বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্বরাগ অবস্থায় রাধার মন যেমন কৃষ্ণ সান্নিধ্যের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আকাশের কালো মেঘেই কৃষ্ণদর্শন লাভ করে। আলোচ্য ভাওয়াইয়া গানের নায়িকাও যেন 'নয়নের কাজল' উপমার মাধ্যমে কৃষ্ণদর্শনের ন্যায় চিত্রকল্প তৈরি করে :

বন্ধু নয়নের কাজল
তিলেক দণ্ড না দেখিলে
মন হয়রে পাগল। (বিপ্লবকুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৭)

গানটিতে 'নয়নের কাজল' অর্থাৎ চোখের কাজল হচ্ছে উপমা আর 'বন্ধু' হচ্ছে উপমান। গ্রামীণ জীবনে মেয়েদের কাছে চোখের কাজল অত্যন্ত প্রিয় নিত্য ব্যবহার্য একটি উপাদান। কাজল পল্লীবালার মায়াময় চোখকে আরো মায়াময় করে তোলে। মেয়েদের প্রিয় এই প্রসাধন তাদের খুবই আপন। ঠিক যেমন তার বন্ধু তার অতি কাছের, অতি আপন। বন্ধুকে এক দণ্ড না দেখলে নায়িকার মনের অবস্থা হয় পাগলিনীর মত। বন্ধুর সাথে তার সম্পর্কের নৈকট্য বোঝানোর জন্য উপমা হিসেবে 'নয়নের কাজল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সতীন নিকা করি আইনলে তোক
ঝগরা করি মাইল্লে মোক
মোক সজালু ভারার তলের এঁদুর
ওরে ভাত না কাপড় ধুরিয়া চাপড়
দয়ার দাদাকে দিচোঙ খবর
পানিয়া মরা ছাড়িয়া না দেয় নাইওর। (বিপ্লবকুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৪)

গানটিতে সতীন সমস্যায় জর্জরিত প্রথম স্ত্রীর মন যাতনার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। সংসারে তার অবস্থান যেন 'ভারার তলের এঁদুর' অর্থাৎ ভারার (গ্রামাঞ্চলের চাল বা ডালের সঞ্চয় করে রাখার পাত্র) তলার ইঁদুরের মত অপ্রয়োজনীয়। নায়িকার স্বামী প্রাণনাথ যখন সংসারে সতীন নিয়ে আসে এবং নায়িকাকে প্রহার করে, ভাত কাপড় না দিয়ে প্রচণ্ড ধিক্কার করে, তার এই অসম্মানজনক পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে লোককবি প্রথম স্ত্রীকে 'ভারার তলের এঁদুর' অর্থাৎ ধান-চাল রাখার যে স্থান নীচে যে ইঁদুর থাকে তার সাথে তুলনা করে উপমা দিয়েছেন। এই গানের কথায় গ্রামীণ জীবনে নারীদের সামাজিক অবস্থান পরিস্কারভাবে প্রকাশিত হয়।

উপরে উল্লেখিত ভাওয়াইয়া গান গুলোর বাণীবৈশিষ্ট্যের উদাহরণসমূহ বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, গ্রামীণ জনজীবনের ভাষার উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে ভাওয়াইয়া গান বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

> ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে এ ধরণের উপমা, রূপক ও প্রতীকী ভাবাবেগের অসংখ্য গান ছড়িয়ে আছে। যা প্রথাগত নন্দন তাত্ত্বিকতার সজ্ঞায় বদ্ধ নয় কিন্তু এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য, রস, সর্বোপরি নন্দনবার্তাই দেয়। শব্দ ও উপমা নির্বাচনে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত এক বিশিষ্টতার দাবি রাখে বৈকি। যেসব আরোপিত নয় বরং বেশি বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং বাঙ্ময়। (জ্যোতির্ময় রায়, ২০১৪: ৩০৭)

প্রকৃতি যেন ভাওয়াইয়া গানের প্রাণ। তাই ভাওয়াইয়া গানের কথায় প্রকৃতির নানা উপকরণ উপমা, রূপক, প্রতীকী যুগ যুগ ধরে ধ্বনিত হয়ে আসছে। সন্দেহ নেই ভাওয়াইয়া একটি নির্দিষ্ট জনজীবন থেকে উদ্ভূত এবং সেই জনজীবনেরই প্রচলিত ভাষা ও বিষয় থেকে নেয়া হয়েছে এর প্রতীক, সাদৃশ্য, শব্দালংকার, শব্দ-দ্বৈত ও উপমা। শুধু বাণী ও সুরের বিশিষ্টতাই নয়, বরং অলংকার, ছন্দ, বাক্যবিন্যাস প্রভৃতির আশ্রয়ে সৃষ্ট চিত্রকল্পগুলো অসামান্য রূপ লাভ করেছে। এতে করে ভাওয়াইয়া সংগীত হিসেবে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি ঐ অঞ্চলের জনজীবনের প্রতিকৃতিও বিনির্মিত হয়েছে। সাহিত্যের বর্ণনাতীত রূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে গানের বাণীর সাথে এইসব উপমা, রূপক, প্রতীকীর মিথস্ক্রিয়া ভাওয়াইয়া গানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাওয়াইয়া গানে প্রতিবিম্বিত চিত্রকল্পগুলিই তার প্রমাণ।

৬. চিত্রকল্প (Imagery)

সাধারণ অর্থে 'প্রতিকৃতি' শব্দের অর্থ কোন বস্তু বা প্রাণীর অবয়ব বা মুখচ্ছবি। বিশেষ করে, চিত্রভাষায় বা চিত্রশিল্পে 'প্রতিকৃতি' শব্দের ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা কিংবা ফটোগ্রাফার তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে, যথাক্রমে এঁকে, চরিত্র বিনির্মাণ করে এবং ক্যামেরাবন্দি করে বস্তু বা মানুষ বা অন্য যেকোন প্রাণীর 'প্রতিকৃতি' বা অবয়ব ফুটিয়ে তোলেন। সাহিত্যে লেখক নানান উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, প্রতীক ব্যবহার করে, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে গড়ে তোলেন প্রাণী বা কোন বস্তুর 'প্রতিকৃতি' বা অবয়ব। সঙ্গীত রচয়িতারাও গানের কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয়ে এবং শিল্পীর দক্ষ উপস্থাপনায় শ্রোতার মনে বস্তু, প্রাণী বা কোন অনুভবের 'প্রতিকৃতি' বা অবয়ব সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সঙ্গীত স্রষ্টা তাঁর কল্পণার চিত্র আঁকার উদ্দেশ্যে সুর ও বাণীর নানান চলন, শ্রুতির স্থিতিস্থাপকতা এবং নির্দিষ্ট সময় সকল মিলিয়ে এক 'বোধের অবয়ব' বা 'অনুভবের প্রতিকৃতি' বিনির্মাণ করেন।

> যখন ভাষার দ্বারা কোনো কিছুর প্রকাশ সম্ভবপর হয় না তখনই তা ছবির দ্বারা কিংবা কথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। তখন বিভিন্ন অলংকার, ছন্দ, বাক্যবিন্যাস প্রভৃতির আশ্রয় নিতে হয়। কেননা এগুলোর সম্মিলিত রূপের দ্বারাই অনির্বচনীয় রূপকে প্রকাশ করা সম্ভব।...সংগীতের মধ্যেও সংগীত স্রষ্টারা এভাবেই চিত্রকল্পের ব্যবহার করে। (বিপ্লব কুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৩)

ভাওয়াইয়া গানের মনন ভাষ্যে দিগন্ত প্রসারী প্রকৃতি প্রকাশ পায় কখনও প্রতীকে কখনও বা চিত্রকল্পে। ভাওয়াইয়া গানের গীতিকারদের রূপ-তৃষ্ণা আর সুগভীর কল্পনাশক্তি তাদের দৃষ্টিনন্দন চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এখানে যিনি গীতিকার তিনিই গায়ক এবং তিনিই নায়ক অথবা নায়িকা। গানের বিষয় তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আর গানের সুরে মিশে আছে তার ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার মৌলিক অনুভূতি। তাইতো শব্দ তাদের সরসে ফুলের রঙে ছবি আঁকে।

> রূপ দেখো তোর সরিষার ফুলে কইন্যা
> যৌবন যায়রে ভাটি

হাড়িয়া ম্যাঘ যেমন মাথার চুলরে কইন্যা
আমার পরাণ নিলে হরিয়ারে। (সোহরাব দুলাল, ২০১৪: ১৬৩)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে বলেছেন :

> অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০০: ৬৪৭)

চিত্রকল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এমন যুক্তি যথার্থ মেনে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, চিত্র এবং সংগীতের মাধ্যমে সাহিত্যের অনির্বচনীয় রূপ প্রকাশ সম্ভবপর হয়। বিভিন্ন অলংকার, বাক্যবিন্যাস, ছন্দের মাধ্যমেই তা প্রকাশিত হয়। তবে একটি জরুরী বিষয় হচ্ছে, চিত্রকল্প শুধু অনির্বচনীয়তাকেই প্রকাশ করে না, এর মধ্যে দিয়ে কবির অনুভব ও মনোজগতের ছবিও ফুটিয়ে তোলে। সংগীত স্রষ্টারাও ঠিক একইভাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার করে। চিত্রকল্পের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন বিপ্লব কুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প' নিবন্ধে, নিম্নে উল্লেখ করা হল :

> ১. চিত্রকল্প ব্যবহার করতে গেলে ভাষা দিয়ে ছবি আঁকতে হয়। যে ছবি পাঠক বা শ্রোতার মনোগোচরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২. চিত্রকল্প ব্যবহারের সময় অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার অনুভবের ও মনোজগতের চিত্র ফুটে উঠবে। অর্থাৎ বাস্তবের ছবিকে নিজের মনের জারক রসে জারিত করে তবেই তা প্রকাশিত হবে। ৩. এক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, বাক্য বিন্যাস, শব্দ ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ের আশ্রয় নিতে হবে। ৪. একটি কিংবা দুটি নয়, অনেকগুলো ছবির সমাহারেই সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি হতে পারে। (বিপ্লব কুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৩)

অর্থাৎ চিত্রকল্প ব্যবহার করতে গেলে বাণী ও সংগীত দিয়ে ছবি আঁকতে হয়। যে ছবি পাঠক অথবা শ্রোতার কল্পনায় একটি দৃশ্যকল্প তৈরি করতে সক্ষম। চিত্রকল্পটি যার দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাঁর অনুভবের ও মনোজগতের প্রতিচ্ছবি চিত্রকল্পে প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মনের মাধুরী মিশিয়ে চিত্রকল্প তৈরি করেন। চিত্রকল্প তৈরিতে মাধ্যম হিসেবে ভাষা, ছন্দ, অলংকার, বাক্যবিন্যাস, শব্দ ব্যবহৃর প্রভৃতি বিষয়ের আশ্রয় নিতে হয়। একটি অথবা দুটি নয়, অনেকগুলো ছবির সমাহারেই সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি হতে পারে।

ভাওয়াইয়া গানের বাণী, সুর এবং চিত্রকল্প, একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতিবিম্বিত রূপ। এই গানে সমাজচেতনা, গণচেতনা, সামাজিক চালচিত্রের ছবিসহ একদিকে যেমন নারীর বিরহবেদনা হাহাকারের চিত্র মর্মস্পর্শী বেদনা বা হাসি-কান্নায় প্রস্ফুটিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে উদাসী, খেয়ালী মইষাল ভাই, মাহুত বন্ধু বা গাড়িয়াল ভাইয়ের জীবন চিত্রও অংকিত হয়েছে। প্রমোদ নাথ তাঁর 'ভাওয়াইয়া সংগীতে সমাজচিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন:

> একদিকে মানুষের জীবনের প্রেমের অনুভূতি, গভীরতা, বঞ্চনা, বিরহকাতরতা ও অনুভব এ সংগীতকে যেমন স্বর্গীয় মাধুর্য দান করেছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজচেতনা, গণচেতনা, সামাজিক চালচিত্রের ছবিও নিপুণভাবে উঠে এসেছে এই সংগীতের মধ্য দিয়ে। (প্রমোদনাথ নাথ, ২০১৪: ২২৯)

সহজ সরল মাটির ভাষায় ভাওয়াইয়া গান রচনায় মানব-মানবীর প্রেম, সামাজিক বাতাবরনে তাদের বিরহকাতরতা, আর্থিক সংকট, জীবনের রূঢ় বাস্তবতা চিত্রকল্পে ফুটে ওঠে। যেমন :

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
ফান্দ বসাইছে ফান্দিরে ভাই
পুটি মাছ দিয়া,
ওরে মাছের লোভে বোকা বগা
পড়ে উড়াল দিয়ারে।
ফান্দে পড়িয়ারে বগা
করে টানা টুনা
ওরে আহারে কুঙ্কুরার সুতা
হল লোহার গুনারে।
ফান্দে পড়িয়ারে বগা করে হায়রে হায়রে
ওরে আহারে দারুণ বিধি
সাথী ছাইড়া যায় রে।
উড়িয়া যায় চকোয়ারে পঙ্খী
বগীক বলে ঠারে, আরে তোমার বগা বন্দী হইছে
ধরলা নদীর পারে রে।
এই কথা শুনিয়া রে বগী—দুই পাখা মেলিল
ওরে ধরলা নদীর পারে যাইয়া দরশন দিল রে।
বগাক দেখিয়া বগী কান্দে রে
বগীক দেখিয়া বগা কান্দে রে।[৩৪]
(আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড, এইচ এম ভি, এন ১৭৩৩২)

উপরে উল্লেখিত গানটিতে আমরা ছোট ছোট দৃশ্যপটের সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ চিত্রকল্প তৈরি হতে দেখি। যেখানে ধরলা নদীর পারে ফাঁদে পড়া একটি বেচারা বগার বেদনা বিধুর পরিস্থিতির কথা বর্ণণা করা হয়েছে। যেমন একটি দৃশ্যের পর আরেকটি দৃশ্য তারপর অন্য আরেকটি দৃশ্যের সমন্বয়ে একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয় ঠিক সেভাবেই এই গানটিতে আমরা যেন একটি পুরো গল্পের চিত্রকল্প দেখতে পাই যার মাধ্যমে ধরলা তীরবর্তী জনজীবনের প্রতিকৃতি বিনির্মিত হয়। উপরে উল্লেখিত গানটির দৃশ্যপট ভাগ করা যায় এভাবে-

১ম দৃশ্য
ফাঁদি যখন বক ধরার জন্য পুটি মাছ দিয়ে ফাঁদ তৈরি করে তখন বোকা বগা সেই মাছের লোভে ফাঁদে উড়ে এসে বসে।

২য় দৃশ্য
ধরলা নদীর পারে বকটি ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। বকটি যেন কান্না ভরা চোখে আশে পাশে সাহায্যের জন্য অসহায় ভাবে তাকাচ্ছে।

৩য় দৃশ্য
কুংকুরার সুতা যা কিনা লোহার তারের মতই শক্ত হয়, সেই সুতা দিয়ে ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং সেই সুতার ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যখন বগা সুতা নিয়ে টানা টানি করে তখন কুংকুরার সুতা যেন আরো শক্ত হয়ে তার পায়ে চেপে বসে।

৪র্থ দৃশ্য
বগা তার এই অবস্থার জন্য বিধি অর্থাৎ বিধাতাকে যেন দায়ী করে।

৫ম দৃশ্য
চকোয়া পঙ্খী বগাকে ধরলা নদীর পারে ফাঁদে আটকে থাকতে দেখে বগীকে খবর জানায়।

৬ষ্ঠ দৃশ্য
খবর পেয়ে দুই পাখা মেলে বগী ধরলা নদীর পাড়ে উড়ে আসে।

৭ম দৃশ্যে
ধরলা নদীর পারে বগার অসহায় অবস্থা দেখে বগী বুঝতে পারে যে বগাকে আর রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই বগা আর বগী একে অন্যের দিকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে কাঁদতে থাকে।

পুরো গানটিতে গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ ধরলা নদীর পাড় এবং সেই সাথে একটি বগা ও একটি বগী এবং তাদের সুভাকাঙ্ক্ষী চকোয়া পাখিকে নিয়ে অপূর্ব এক গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্র আমরা দেখতে পাই। গ্রাম্য প্রকৃতির সাধারণ একটি দৃশ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এমন একটি মানবিক গল্প তৈরি করা হয়েছে। এই গানের শ্রোতারা তাদের মনে গানের সুর আর কথা দিয়ে এমন একটি দৃশ্যকল্প তৈরি করে যেন সত্যিকার অর্থে বগা এবং বগীর কান্না উপলব্ধি করতে পারছে। ফাঁদে পড়া বগা আর অসহায় বগীর এই বাস্তবতা নদী তীরবর্তী জনমানুষের নৈমিত্তিক বঞ্চনা ও তার থেকে মুক্তির উপায়হীনতাজাত অসহায়ত্বেরই রূপকধর্মী বর্ণনা। যা নিখুঁত চিত্রকল্পে যেমন প্রকৃতিকে বর্ণনা করে তেমনি নিগৃহীত জনগোষ্ঠীর নিয়তির কাছে অসহায় সমর্পণের নৈমিত্তিকতাকেও বর্ণনা করে।

লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়াতে এমন কিছু কাহিনীধর্মী গান রয়েছে যার তুলনা আমরা সহজেই ছোটগল্পের সাথে করতে পারি। এই ধরণের গান শোনার সময় চোখের সামনে একটি গল্পের চিত্রকল্প ভেসে উঠে। নায়েব আলি (টেপু)-র একটি গানের উল্লেখ করা হল :

> মরি—এ এ এ হে
> ভেঙ্গুর নদীর উপুরা হইচে যাদুরা বৈদ্যের বাড়ি—হায়রে যাদুরা বৈদ্যের বাড়ি
> চলন কোনা সাটাম সুটুম গোপের উপরা দাড়ি— ও দাদা দেমাক বড়
> আসুক পাতি হইলে কেহ বৈদক বুলি যায়—হায়রে বৈদিক বুলি যায়
> ছাচায় মিচায় দেখিয়া খাটি দোষের কথা কয়—বাতে দেয় দমকা খরচ
> যেইটে নাগিবে একটা কৈতর সেইটে পাটা-খাসি—হায়রে সেইটে পাটা খাসি
> যেইটে নাগিবে হাসের ডিম্যা সেইটে হাসাহাসি—আরো চায় পায়রা কৈতর
> এইমতে কবিরাজি যাদুরা কল্লে মাস চারি—হায়রে কল্লে মাস চারি
> তাতে আসিল রুগীর খবর রাধানাথের বাড়ি—রুগীটার জ্বর হইয়াছে
> হাতে নিল টাকা রাধানাথ কোচায় নিল কড়ি—হায়রে কোচায় নিল কড়ি
> বেলা দুপুরে গেল রাধানাথ যাদুরা বৈদ্যের বাড়ি—কথা কয় বৈদ্যের আগে
> দুইট্যা টাকা ন্যাও মহাশয় দুইট্যা টাকা ন্যাও—হায়রে তিনট্যা টাকা ন্যাও
> আমার রুগী কাতর বেশি আমার বাড়ি যাও—চল যাই আমার বাড়ি
> টাকা পায়া যাদুরা রোজা না থাকিল রয়া—হায়রে না থাকিল রয়া
> দাওয়ায় ঝুলি ঘারোত লৈয়া বাইর হৈল সাজিয়া—রোজা যায় রুগীর বাড়ি
> হাত দেখিয়া হ্যার যাদুরা রোজা রাধানাথক বলে—হায়রে রাধানাথক বলে
> না নাগিবে ওষধ পাতি দিশ্যা করা নাগে—একটা চাই বড় পাটা
> একটা চাই বড় পাটা উচ্যামোটা মস্ত লম্বা দাড়ি—হায়রে মস্ত লম্বা দাড়ি।
> ঝারিয়া নামাঙ বিষের জ্বর আদিয়া যাইম মুই বাড়ি—তবে পাও ভালো করিতে। (বিপ্লব কুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৬-১৭)

ভেঙ্গুরা নামের একটি নদীর পাড়ে যাদুরা বৈদ্যের বাড়ি। যার গোঁফের ওপর দাড়ি অর্থাৎ যে দেমাগ দেখিয়ে দাপোটের সাথে চলা ফেরা করে। গ্রামের কারো অসুখ হলে যখন এই বৈদ্যকে ডাকা হয় তখন সে মিছে মিছি অসুখের নাম করে অনেক টাকা খরচের কথা বলে। যেখানে একটি কবুতর দিয়েই কাজ চলতে পারে সেখানে এই বৈদ্য পাঁঠা অথবা খাসির কেনার দাবী করেন। আবার যেখানে হাঁসের ডিম দিয়েই কাজ চলতে পারে সেখানে সে দাবী করে হাসা বা হাসি। এই ভাবেই কবিরাজ যাদুরা উপার্জন করে এবং মাস পার করে। একবার গ্রামের রাধানাথের বাড়িতে অসুখ দেখা দেয়। রোগীকে বাঁচানো উদ্দেশ্যে রাধানাথ টাকা-কড়ি নিয়ে দুপুর বেলা যাদুরা বৈদ্যের বাড়ি হাজির হয়। বৈদ্যকে অনুনয় করে বলে দুই বা তিন টাকা যাই লাগুক না কেন বৈদ্য যেন তার বাড়ির রোগীকে দেখতে যায়। টাকা পেয়ে যাদুরা বৈদ্য আর চুপচাপ না থেকে রোগী দেখার জন্য সেজে গুজে বের হয়। রোগীর হাত দেখে যাদুরা বৈদ্য রাধানাথকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, এই রোগীকে ঔষধ দিয়ে কোন লাভ নেই, বরং একটি বড় পাঠা বলি দিয়ে ঝার ফুক করে রোগীর এই বিষ জ্বর নামাতে হবে। তবেই সে রোগীকে সারিয়ে তুলতে পারবে।

এই পুরো গানটি যেন একটি ছোট গল্প, যা আমাদের চোখে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। গ্রামীণ সমাজে ওঝা বা বৈদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষ এই সব বৈদ্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। তারা ঠিকই বুঝতে পারে যে তারা প্রতারণার স্বীকার হচ্ছে। কিন্তু নিরুপায় হয়ে তারা এই সব বৈদ্যের চিকিৎসার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। প্রতীক, উপমা, রূপক, শব্দ-দ্বৈতের আলঙ্কারিক ব্যবহারের মাধ্যমে গানটি গ্রামীণ সমাজ-চিত্রের চিত্রকল্প তৈরির একটি সার্থক উদাহরণ।

ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প তৈরির আরেকটি সার্থক উদাহরণ নিম্নরূপ :

মোর বন্ধু হাল বয়, মাথা তুলি না চায়
মুইঞ নারী যাঙ জলের ঘাটে
থমকি থমকি হাটং, চউখে ইশারা করোং
তবু বন্ধু না দ্যাখে মোকে। (বিপ্লব কুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৬)

এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে গানের প্রতিটি লাইন যেন নাটকের এক একটি দৃশ্যকল্প। প্রতিটি দৃশ্য এমন নিপুনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে যার দৃশ্যকল্প আমরা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারি। গ্রামীণ জীবনের ছোট্ট নদী। সেই নদীতে রয়েছে নৌকা আর নায়ের মাঝি। গ্রামের এই সাধারণ মাঝির প্রেমে পাগল কোন পল্লীবালা। সে গৃহস্থালির কাজের ছলে বারবার নদীর ঘাটে পানি নিতে ছুটে যায়। পাছে কেউ তার এই গতি বিধি লক্ষ্য করে অথবা তার মনের উচাটন ভাব সবার চোখে পড়ে সেই ভয়ও তাকে ভীত করে। তাই নদীর ঘাটে যেয়ে সে থমকে থমকে হাটে আর চোখের ইশারায় তার প্রেমিককে মনের কথা বলতে চায়। কিন্তু মাঝি বন্ধু যেন কিছুই দেখতে পায় না এমন কি চোখের ইশারা বোঝার চেষ্টাও তার নেই। গ্রামীণ জনজীবনের সাধারণ একজন পল্লীবালার প্রেমানুরাগ চমৎকার ভাবে গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়াতে এমন কিছু কাহিনীধর্মী গান রয়েছে যার তুলনা আমরা সহজেই ছোটগল্পের সাথে তুলনা করতে পারি। এই ধরণের গান শোনার সময় চোখের সামনে একটি গল্পের চিত্রকল্প ভেসে উঠে। ভাওয়াইয়া গানে নায়ক-নায়িকার প্রেম ও মান-অভিমান ব্যক্ত করতে গিয়ে পল্লী কবিরা চিত্রকল্পের ব্যবহৃর করেছেন। যেমন :

মোর কালা বাড়ি আইসে
পিড়া দিতে কালা মাটিত বইসে
মোর প্রাণ কালা রে।
হাতে হাতে গুয়া দিলে না খায়ও রে।

কিংবা

কি গাড়িয়াল ফিরিয়ারে আইসো
কিবা কইচং কিবা নাই কং
তাতে হইলেন গোঁসা।
ও তুই কিসোৎ গোসা হলুরে
লাল বাজারের চেংড়া বন্ধুরে। (মুহাম্মদ আলীমউদ্দীন, ২০১৪: ৯৪)

এখানে নায়ক অথবা নায়িকার মান-অভিমানের চিত্র স্পষ্টাকারে প্রকাশিত হয়েছে। নায়ক বাড়ি এলো অভিমান ভরা মন নিয়ে, পিড়িতে না বসে সে মাটিতে বসছে, হাতে গুয়া (সুপারী) দিলেও সে খাচ্ছে না। অন্য গানটিতে দেখা যায়, নায়িকা নিজের মনে অনুশোচনা করছে, হয়তো সে মনের অজান্তে নায়ককের মনে দুঃখ দিয়ে কিছু বলে ফেলেছে।

প্রেমিক-প্রেমিকার মান অভিমান পর্বের আরো অনেক ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণ রয়েছে। এই গানেগুলোর লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, গানের প্রতিটি লাইন যেন একটি নাটকের অনেকগুলো দৃশ্যকল্প। প্রতিটি দৃশ্য এমন নিপুনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন আমরা সহজেই তা কল্পনা করে নিতে পারি। যেমন :

ও শ্যাম কালিয়ারে
কালা যাইয়ো যাইয়ো কালা
আগুনের ছলে।

কিংবা

মোর বন্ধু হাল বয়, মাথা তুলি না চায়
মুইঞ নারী যাঙ জলের ঘাটে
থমকি থমকি হাটং, চউখে ইশারা করোং
তবু বন্ধু না দ্যাখে মোকে। (বিপ্লব কুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৬)

বিভিন্ন ধরণের পুরানের ভাঙাগড়ার চিত্রকল্পের কায়া গঠিত হয় উৎপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের সমন্বয়ে। উত্তরের এই প্রাণের সংগীতের মধ্যেও চিত্রকল্পের অধিক ব্যবহার লক্ষণীয়।
যেমন :

কিসের মোর রান্ধন কিসের মোর বারণ
কিসের মোর হলদিয়া বাটা
মোর প্রাণের নাথ অন্যের বাড়ি যায়
মোরে আঙিনা দিয়া ঘাটা
প্রাণ সজনী কার আগে কব দুঃখের কথা।

কিংবা

ধিক ধিক ধিক মৈষাল রে
আরে ও মৈষাল
ধিক তোমার হিয়া
আর কত কাল আখিম যৌবন
অঞ্চলে বান্ধিয়া মৈষাল রে। (বিপ্লব কুমার সাহা, ২০১৪: ৩১৮)

উপরে উল্লেখিত প্রথম ভাওয়াইয়া গান 'অন্যের বাড়ি যায় মোর আঙিনা দিয়া ঘাটা' এবং 'যৌবন অঞ্চলে বান্ধিয়া' এই দুটি উৎপ্রেক্ষার প্রথমটিতে অভিমানে সিক্ত নায়িকা নিজের প্রাণনাথের বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে যেন চিত্রকল্পটি তৈরি করেছেন। যখন নায়িকার প্রাণনাথ তারই

আঙিনা দিয়ে অন্য নারীর বাড়ি যায় তখন বেদনা-বিধূর নায়িকার মনের যে অবস্থা হবে তার সাথে তুলনা দিয়ে এই গানের চিত্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। এরপরের গানটিতে নায়িকা নায়কের জন্য অপেক্ষানুরাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে নায়িকা তার যৌবন আঁচলে বেঁধে রাখার সাথে তুলনা করেছেন। দুটি গানেই লোককবি সার্থক চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। ভাওয়াইয়া গানের বাণীতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের সমুহের প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থক চিত্রকল্পের বুনন দেখতে পাই।

উপসংহার

অরণ্য প্রকৃতির বুক ভেদ করে যে ভাষায়, উত্তরবঙ্গের মানুষের মর্মস্পর্শী বেদনা বা হাসি-কান্না প্রস্ফুটিত হয় তা হয়তো চিত্রকল্প ব্যবহ্নরের জন্যই সম্ভব। এই গানে গ্রামীণ জনজীবনের সুনিপুণ চিত্র যেন নকশীকাঁথার মতই ভেসে উঠে আমাদের মানসপটে। ভাওয়াইয়া গানের গীতিকারদের রুপ-তৃষ্ণা আর সুগভীর কল্পনাশক্তি তাদের দৃষ্টিনন্দন চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এখানে যিনি গীতিকার তিনিই গায়ক এবং তিনিই নায়ক অথবা নায়িকা। বাণী, সুর আর গায়কী এই তিনের মেলবন্ধনে ভাওয়াইয়া গান যেন হয়ে উঠে উত্তরবঙ্গের মানুষদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। এই গানের রচয়িতারা সময়, প্রতিবেশ, প্রকৃতি ও গ্রামীণ জনজীবনকে গভীর ভাবে প্রত্যক্ষণ করেই এই সুরের ছবি এঁকেছেন। সময়ের পরিক্রমায় গানের বিষয়, উপমা, প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণে এসেছে বৈচিত্র, নতুনত্ব ও সমসাময়িকতা। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা নিয়ে রচিত ভাওয়াইয়া গানে প্রতীক ও প্রতিকৃতি বিনির্মাণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে গ্রামীণ জনজীবণের কল্পচিত্র সার্থক রূপে উপস্থাপিত হয়।

তথ্য-নির্দেশ

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*, কলকাতা ১৯৮৩, পৃ. ৩৯৯।

আব্বাসউদ্দিন আহমদ, *দিনলিপি ও আমার শিল্পী জীবনের কথা*, ঢাকা, জুলাই ২০১২, পৃ. ১৪১।

আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড, এইচএমভি, এন ২৭০৪৪। নভেম্বর ১৯৪০।

আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড, এইচ এম ভি, এন ১৭৩৩২।

আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড, এইচএমভি, এন ১৭০০৬।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, কলিকাতাঃ ক্যালক্যাটা বুক হাউজ, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃঃ ২৫৭।

জ্যোতির্ময় রায়, ‘ভাওয়াইয়া সংগীতে সৌন্দর্যরূপ ও নান্দনিকতা’, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩০৬।

জ্যোতির্ময় রায়, ‘ভাওয়াইয়া সংগীতে সৌন্দর্যরূপ ও নান্দনিকতা’, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩১১।

জ্যোতির্ময় রায়, ‘ভাওয়াইয়া সংগীতে সৌন্দর্যরূপ ও নান্দনিকতা’, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩০৯।

জ্যোতির্ময় রায়, ‘ভাওয়াইয়া সংগীতে সৌন্দর্যরূপ ও নান্দনিকতা’, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩০৯।

জ্যোতির্ময় রায়, ‘ভাওয়াইয়া সংগীতে সৌন্দর্য রূপ ও নান্দনিকতা’, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩০৭।

নির্মল দাশ, 'ভাওয়াইয়ার ভাষাতত্ত্ব', *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১৬৭।

প্রমোদনাথ নাথ, 'ভাওয়াইয়া সংগীতে সমাজচিত্র', *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-২২৯।

বিপ্লবকুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প' *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৭।

বিপ্লবকুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প', *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৪।

বিপ্লব কুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প', *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৩।

বিপ্লব কুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প', *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৩।

বিপ্লব কুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প', *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৬-১৭।

বিপ্লব কুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প' *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৬।

বিপ্লব কুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প' *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৬।

বিপ্লব কুমার সাহা, 'ভাওয়াইয়া গানে চিত্রকল্প' *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৩১৮।

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*, কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১১৮।

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*, কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১১৯।

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*, কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১১৮।

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, '*উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*', কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১১৯।

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*, কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১১৯-২০।

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, '*উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*', কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ২০০।

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা*, কলকাতা, ২ অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১২০।

মুস্তাফা জামান আব্বাসী, *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি (২য় খণ্ড)*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৭।

মুস্তাফা জামান আব্বাসী, *ভাওয়াইয়ার জন্মভূমি (২য় খণ্ড)*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৯।

মুহাম্মদ আলীমউদ্দীন, 'ভাওয়াইয়া : শরীরী সত্তায় বর্ণিল-অন্তর স্পন্দনে প্রাণবন্ত, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-৯৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, খণ্ড-৪, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ.-৬৪৬।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, খণ্ড-৪, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ.-৬৪৭।

সোহরাব দুলাল, ভাওয়াইয়ার শিল্প-সুষমা, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস (সম্পাঃ), কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-১৬২।

সোহরাব দুলাল, ভাওয়াইয়ার শিল্প-সুষমা, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস (সম্পাঃ), কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-১৬৩।

সোহরাব দুলাল, ভাওয়াইয়ার শিল্প-সুষমা, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস (সম্পাঃ), কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-১৬৩।

সোহরাব দুলাল, ভাওয়াইয়ার শিল্প-সুষমা, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস (সম্পাঃ), কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-১৬৩।

সোহরাব দুলাল, ভাওয়াইয়ার শিল্প-সুষমা, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস (সম্পাঃ), কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-১৬৩।

সোহরাব দুলাল, ভাওয়াইয়ার শিল্প-সুষমা, *বাংলার ভাওয়াইয়া*, রতন বিশ্বাস (সম্পাঃ), কলকাতা, ২০১৪, পৃ.-১৬৩।

[Abstract: In Bhawaiya song analysis mentioned above, to cite its characteristics certain ‘Symbolism’, ‘Parallelism’, ‘Ornamentation’ of words, ‘Double Ornamentation’ of repeated words, ‘Metaphor’, ‘Imagery’ seemed to have been used successfully. The way the linguistic approach and imageries have been used to reveal the heart quenching pain, grief and joy of the people of North Bengal and its nature and mass in ‘Bhawaiya’ songs perhaps, it was possible by the use of the imageries in these songs. In these songs, the meticulously weaved imageries of rural life and livelihood reveals in our mind space. Hence, the thirsts of imagery, in-depth capability of imaginations and insights inspired the ‘Bhawaiya Lyricists’. Here in some instances, one who’s writing the lyrics is the singer by himself or it reflects his own life experiences. The lyricists of these songs have rendered the pictures of everyday rural living and their through their musical voices. Henceforth, the lyrics, music and style of singing turn out to be the voices of the hearts of the people of North Bengal.

As the time wore on, changes seemed evident in the content of the songs, metaphors and brought newness and contemporaneity in symbols and making of portraitures. It looks an also noticeable that `Bhawaiya’ songs, as they have been created based on lives of common mass, almost all types of symbols and the styles of making imageries are present in them. Through which the aesthetic beauty sprinkles in the listener’s mind space.]